159

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ MAY 17 1999
পৃঃ ৫ কলাম ১

ছাত্রদলের ১২ দফার বিক্ষোভ মিছিল- আসল লক্ষ্য কি ছিল?

মোঃ আব্দুল আওয়াল মিঞা

২৫ এপ্রিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে কয়েক হাজার ছাত্রের একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল পরিচালিত করে নিয়ে গিয়েছিলো। সরকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আগে থেকেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়মুখী সকল রাস্তার দেড় দুই কিলোমিটার দূরবর্তী পয়েন্ট পর্যন্ত সবরকম মিটিং-মিছিল সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ১৪৪ ধারা জারি করে রেখেছিলো। সংসদ অধিবেশন চলাকালীন এবং এ জাতীয় কোন বিক্ষোভ কর্মসূচী থাকলে অতীতেও সরকারের পক্ষ থেকে সব সময় এরকমই করা হয়েছে। স্বভাবতঃই ছাত্রদলের ২৫ এপ্রিলের মিছিলটি পল্টন ময়দান থেকে শুরু হয়ে বাংলামটর পর্যন্ত গিয়ে পুলিশের বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। এ পর্যন্ত সবই ছিল অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ। তারা সেখানে একটি সমাবেশ করছিল। ঠিক সে সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দুইজন কর্মকর্তা সেখানে এসেছিলেন। তারা ছাত্রদল নেতৃবৃন্দকে জানিয়ে ছিলেন যে, খোদ প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে পাঠিয়েছেন। তারা বিক্ষোভরত ছাত্র সংগঠনের একটি প্রতিনিধিদলকে তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করার জন্যে নিয়ে যেতে এসেছেন। এটি ছিল সরকারের সর্বোচ্চ আসনে আসীন ব্যক্তির কাছ থেকে সঙ্গত এবং অভিপ্রেত একটি পদক্ষেপ।

আন্দোলনরত যে কোন মিছিল থেকে যার কাছে দাবী দাওয়া অত্যন্ত সম্মানজনক এবং শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা হিসাবে এমনিভাবেই তিনি দূত পাঠিয়ে প্রতিনিধিদল নিয়ে গিয়ে আলাপ আলোচনা করে থাকেন। এটিই রেওয়াজ। স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রী আশা করেছিলেন বিক্ষোভরত ছাত্রদের একটি টীম তাঁর কাছে যাবে এবং তিনি তাদের কথা শুনতে পারবেন। ভিন্ন পরিস্থিতিতে আবার অন্যরকমটিও ঘটে থাকে। যখন বিক্ষোভকারীদের কোন কথাই শুনতে চাওয়া না হয় তখন সেখানে কোন দূত কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যায় না। বরঞ্চ কঠোর ব্যবস্থার অংশ হিসেবে যে কোন মূল্যে এসব সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয়।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তা করেননি। তিনি ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন। এবং কথা বলতে যখন চেয়েছিলে তখন অবশ্যই ছাত্রদলের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে তার মনোভাব ছিল ইতিবাচক। তা না থাকলে তিনি তার দু'জন কর্মকর্তাকে সমাবেশ স্থলে প্রতিনিধিদল আনতে পাঠাতেন না। কিন্তু তারা এলেন না তারা জানিয়ে দিলেন যে, এই সরকারের সাথে তারা কোন কথা বলবেন না।

কিন্তু আন্দোলন এবং দাবী বাস্তবায়নের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এমনটি হওয়ার কথা নয়। ছাত্রদল তাদের যে সব দাবী-দাওয়া পূরণের জন্য এই মিছিল এবং সমাবেশ করেছিলো সেসব স্মারকলিপি আকারে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করা এবং সর্বোচ্চ সুযোগটি অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকার সেক্ষেত্রে যদি ঘটেই যায় তা হলে এসব দাবী-দাওয়া নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করাও দাবীর পক্ষে যৌক্তিকতা তুলে ধরা। সঙ্গত হলে সে সবে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি আদায় করাই থাকে এ জাতীয় বিক্ষোভ মিছিলের চূড়ান্ত অভীষ্ট। কিন্তু ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ সে পথে যাননি। খোদ প্রধানমন্ত্রীর আলোচনার আগ্রহকে তারা এক কথায় নাচক করে দিয়েছেন। মিছিলটি বাংলামটর পয়েন্টে বাধাগ্রস্ত হওয়ার সাথে সাথে পুলিশের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করেছিলেন। তাতে পুলিশবাহিনীর কয়েকজন সদস্য আহত হন। তা সত্ত্বেও পুলিশ তখন কোন পাল্টা ব্যবস্থা নেয়নি। এরপর সেখানে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ হয়েছে। রাস্তায় মিটিং করা নিষিদ্ধ হলেও পুলিশ কোন বাধা দেয়নি। সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য দেয়া হয়েছে। পুলিশের তাতে কিছুই আসে যায়নি। তারা পুরোদস্তুর নির্বিকারই থেকেছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রেরিত কর্মকর্তা দু'জন পৌঁছুলে তাদেরকে স্মারকলিপি নেয়া এবং বিক্ষোভরত ছাত্র প্রতিনিধিদল নেয়ার প্রস্তাব দেয়ার জন্য ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছে পুলিশ। প্রধানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিবদ্বয় প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে যাওয়ার পর ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ তাদের সংক্ষিপ্ত সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সাথে সাথে প্রচন্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরিত হতে থাকে। বৃষ্টির মত ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু হয়ে যায়। রমনা থানার ওসি রফিকুল ইসলাম এবং সার্জেন্ট শাজাহান আহত হন। নিউ ইস্কাটন এলাকায় গাড়ী, বাস, বেবীট্যাক্সি ভাংচুর হতে থাকে। ইষ্টার্ন টাওয়ার নামক বহুতল ভবনের নীচে দাঁড়ানো একটি গাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। শুরু হয়ে যায় এক মহাতান্ডব। মনে হতে থাকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে কোন ১২ দফা/১৪ দফা দেয়ার জন্যে এরা আসেনি। এসবই যেন ছিল পূর্ব পরিকল্পিত এবং মূলত এদের লক্ষ্য একটি অরাজক অবস্থা সৃষ্টি। পরিস্থিতিতে বিক্ষোভকারীদের কাঙ্ক্ষিত চরম উত্তাপ সৃষ্টি করার একপর্যায়ে পুলিশ যখন আক্রান্ত হয় তখন পাল্টা পুলিশী ব্যবস্থা অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। যাদের গাড়ী ভাংচুর হয়েছিলো মহল্লার বিরুদ্ধবাদীদের নেতৃত্বে তাদেরও মিছিল শুরু হয়ে যায়। এ সময়ে কয়েকজন ছাত্রদল কর্মীকে প্রহৃত হতেও দেখা যায়।

প্রধানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিবদ্বয় প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে যাওয়ার পর ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ তাদের সংক্ষিপ্ত সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সাথে সাথে প্রচন্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরিত হতে থাকে। বৃষ্টির মত ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু হয়ে যায়। রমনা থানার ওসি রফিকুল ইসলাম এবং সার্জেন্ট শাজাহান আহত হন। নিউ ইস্কাটন এলাকায় গাড়ী, বাস, বেবীট্যাক্সি ভাংচুর হতে থাকে। ইষ্টার্ন টাওয়ার নামক বহুতল ভবনের নীচে দাঁড়ানো একটি গাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। শুরু হয়ে যায় এক মহাতান্ডব। মনে হতে থাকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে কোন ১২ দফা/১৪ দফা দেয়ার জন্যে এরা আসেনি। এসবই যেন ছিল পূর্ব পরিকল্পিত এবং মূলত এদের লক্ষ্য একটি অরাজক অবস্থা সৃষ্টি। পরিস্থিতিতে বিক্ষোভকারীদের কাঙ্ক্ষিত চরম উত্তাপ সৃষ্টি করার একপর্যায়ে পুলিশ যখন আক্রান্ত হয় তখন পাল্টা পুলিশী ব্যবস্থা অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। যাদের গাড়ী ভাংচুর হয়েছিলো মহল্লার বিরুদ্ধবাদীদের নেতৃত্বে তাদেরও মিছিল শুরু হয়ে যায়। এ সময়ে কয়েকজন ছাত্রদল কর্মীকে প্রহৃত হতেও দেখা যায়।

একটি অত্যন্ত সুসংগঠিত মিছিলকে যে কতটা বিশৃংখল করে তোলা যায় সেদিনকার সমস্ত ঘটনাগুলো তারই স্বাক্ষর বহন করে। যেসব দাবী-দাওয়াতে এই মিছিল আয়োজন করা হয়েছিলো যেমন ছাত্র বেতন হ্রাস, শিক্ষা উপকরণের দাম কমানো, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ এবং কারাবন্দী ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের মুক্তি এ সবই ছিল অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য। এসব দাবী শুধু তাদেরই নয় ছাত্রদের অভিভাবক এবং পিতামাতা হিসাবে সমগ্র দেশবাসীরই এতে কোন দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই। ছাত্রদের দাবী-দাওয়া এমনই হওয়ার কথা। আমার মনে হয় ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বললে একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ হিসাবে তিনি নিজেও এসব দাবীর কোনটিই উড়িয়ে দিতে পারতেন না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এটিই যে, এই বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ এবং আন্দোলন ছাত্রদের স্বার্থ সংক্রান্ত কোন লক্ষ্য হাসিলের জন্যে সম্ভবতঃ সেদিন পরিচালিত হয়নি। এর উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং পুরোপুরি রাজনৈতিক। আর সে লক্ষ্য নিয়েই সেদিন রাজধানীর বাংলামটর এলাকায় এমনই চরম অরাজক একটি পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটানো হয়েছিলো।

এদেশের ছাত্র রাজনীতি অতীতে দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে এবং ছাত্রসমাজের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া বাস্তবায়নে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। আজ আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এদেশের ছাত্রনেতৃবৃন্দ এবং তাদের সংগ্রামী চেতনাকে বিপথগামী করা হচ্ছে। তারা ব্যবহৃত হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের দাবার ঘুঁটি হিসেবে। আর এজন্য প্রথমেই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে তাদের নৈতিক মূল্যবোধকে। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষায় লাগামহীন নকল প্রবণতা- তাতে অভিভাবক, শিক্ষক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের সক্রিয় সহযোগিতা আমাদের শিক্ষা অঙ্গনকে কলুষিত করে তুলেছে। যে মুষ্টিমেয় অভিভাবক, শিক্ষক এবং ম্যাজিস্ট্রেট এসবের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন তারা চরমভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রদের কাছে তারা শ্রেণীশত্রু হিসাবে বিবেচিত হচ্ছেন। নকল করে ডিভিশন পাওয়া এসব ছাত্র যখন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আসেন তারা লেখাপড়া করে পাস করে আসা ছাত্রদের সাথে কোন প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেন না। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এসব অপাংক্তেয় ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ক্ষমতা দখল এবং ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার শুরু করে দেয়। এ প্রক্রিয়ায় এদের মাঝে আজ প্রচুর টাকা ছড়ানো হচ্ছে বা অন্যায় উপার্জনের মাধ্যমে তাদেরকে বিপুল সম্পদ পাইয়ে দেওয়ানো হচ্ছে। শ্রম নয়, সহিংসতায় অর্জিত এই অর্থ তাদেরকে আরও উগ্র এবং বেপরোয়া করে তুলছে। আমাদের জাতীয় জীবনে এরাই ব্যবহৃত হয়ে চলেছে রাজনৈতিক সন্ত্রাস, অরাজকতা এবং অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে।

ছাত্রদলের বন্ধুরা অনেকেই হয়তো জানেন দেশের মানুষ এখন ছাত্রদেরকে আর তাদের ত্রাতা হিসাবে দেখে না। তারা আজ ছাত্র রাজনীতিকে প্রচন্ড ভয়ের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। ২৫ এপ্রিল বাংলা মটরের ঘটনা এ ভীতিকে আরও বাড়িয়েই দিয়েছে। মানুষ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে এটি উপলব্ধি করছে যে, এদিন ছাত্রদলের কয়েক হাজার ছাত্র তাদের বেতন কমানো বা শিক্ষা উপকরণের মূল্য হ্রাসের দাবী আদায়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর মিছিল নিয়ে যাননি। সেদিন তারা গিয়েছিলেন শক্তি প্রদর্শনের জন্য। এ কথাই প্রমাণ করতে যে, তাদের শক্তির সামনে ক্ষমতাসীনেরা নিতান্তই পলকা এবং তাদের এই শক্তি ক্ষমতাসীনদের উৎখাতে ব্যবহৃত হবে।

কিন্তু এ কথাতো তাদের ভুলে যাওয়ার কথা নয় যে, একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকারকে এত সহজে ক্ষমতাচ্যুত করা যায় না। যদি তা করা যেতো তা হলে ১৯৯৬-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারীর একদলীয় নির্বাচনের পূর্বেই সে সময়ের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলকে অসংখ্য বড় বড় মিটিং মিছিল সমাবেশের সফলতায় তৎকালীন বিরোধী দলগুলো '৯৬-এর ৩০শে মার্চের অনেক আগেই ক্ষমতাচ্যুত করে ফেলতে পারতো।

ছাত্রদলের একথাও ভুলে যাওয়ার কথা নয় যে, তাদের মূল রাজনৈতিক সংগঠন বিএনপি প্রচন্ড গণজাগরণের মুখোমুখি হয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধানের অংশে পরিণত করেছে। আগামী জাতীয় নির্বাচন সেই বিধানের আওতায় যথাসময়েই অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে তাদের নেত্রী যতই বলুন না কেন যে, এই সরকারের অবস্থা নিতান্তই দুর্বল এবং আর একটি ধাক্কা দিলেই সরকার পড়ে যাবে একথা আমাদের দেশের সাধারণ মানুষেরা '৯৬-এর অভিজ্ঞতার পর আর বিশ্বাস করে না। দেশের সব মসজিদ থেকে আযানের পরিবর্তে উলুধ্বনি শোনা যাবে বা গঙ্গার পানি চুক্তিতে পানি পাওয়া যাবে না বরঞ্চ এতে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে যাবে অথবা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি করে দেশের এক-দশমাংশ ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এসব উক্তি বাস্তবতার নিরিখেই যেমন জনগণ অবিশ্বাস করে, সময়ের আগে এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হবে এ কথাতেও মানুষ তেমনিভাবে কোন সত্যতা খুঁজে পায় না। শেখ হাসিনা বা খালেদা জিয়ার বলা না-বলাতে নয়- ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে একমাত্র এদেশের জনগণ যাদের মাঝে বেগম জিয়া বা শেখ হাসিনার দলের লোকসংখ্যা সব মিলিয়ে শতকরা ৩৫%-এর বেশী নয়। বাকী ৬৫% পুরোপুরি অরাজনৈতিক; কিন্তু সচেতন। তারাই সিদ্ধান্ত নেবে ভবিষ্যতে কে ক্ষমতায় আসবে বা আসবে না। সেক্ষেত্রে জাতীয় জীবনে অস্থিরতা সৃষ্টি করা হলে তাতে দেশের সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলবে যা জাতির জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না। ❑